কোষাগার

শেখর দাস

এ কে ফর্টিসেভেন তো রাশিয়ান গান। রাশিয়া মিত্রদেশ। বন্ধুর শস্ত্রে আমার দাদা মারা গেল কেন?

পাহাড়ি ষ্টেশনের আট কিলোমিটার দূরে রেল লাইনের পাশে যেখানে টানেল শেষ হয়ে পোলের শুরু, লাশ পাওয়া গেল আটদিন পর। আটদিন, অর্থাৎ ওরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল সাইডিঙের ক্যাম্প থেকে তিন তারিখ সকাল দশটার একটু পর।

দাদা নাকি তখন জরিপের মানচিত্রে ব্যস্ত। রিপোর্ট শিট পনেরো তারিখের আগে দেরাদুন পৌঁছাতে হবে, ডাটাশিট নিয়ে লোক যাবে গুয়াহাটি। সেখান থেকে সমস্ত ইনফরমেশন লেআউট ই-মেলে যাবে।

ছজন ক্যাম্পে ছিল। কুক দুজন, অস্থায়ী শ্রমিক দুজন, ওভারসিয়ার একজন। দাদাকে নিয়ে মোট ছজন। বাকিরা সাইডিঙের তিন কিলোমিটার দূরে।

পলি-রেকসিনের ধোঁয়াটে টেন্ট পড়েছিল চারটে। টেন্টগুলোর পেছনে নাকি একনাগাড়ে ঢাল।

একেবারে তলায় দিদামছড়ার ঝর্ণা। বড় নদীতে পড়ে মিশেছে।

ক্যাম্পের সবার পানীয় জল, স্নান-টান, ধোয়া-মোছা, রান্নার জল সব চলত ঝর্নার চলে।

পরে এসব ওভারসিয়ার বলেছে। দাদার বডি নিয়ে দলের সঙ্গে সেও এসেছিল।

দশটার পর ওরা এল মোট চারজন। মাথায় বারান্দাওয়ালা দুটি, ক্যামোফ্রেজ ডাঙ্গেরিজ, জঙ্গলে পাঁচফুট দূরে দাঁড়ালেও ধরা যায় না,। পোশাকে রঙের চাতুরি।

প্রত্যেকের হাতেই প্রযুক্তির গর্ব করা শৈলী স্বনিয়ন্ত্রিত মারণযন্ত্রের। নিমেষে জ্বলন্ত সীসা উগরে দেয় এমন কাগজপত্র সব লণ্ডভণ্ড করে দাদাকে তুলে নিয়ে গেল ওরা। কেউ কিছু বলতে পারেনি। না কুক, না শ্রমিক, না ওভারসিয়ার। শুধু খবরটা দিয়েছিল পরে ওদের বেসক্যাম্পে। কারা নিয়ে গেল দাদাকে? ওরা নিয়ে গেল—এটুকুই। ওরা মানে তো ওরা। যারা উপমহাদেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বিভিন্ন নামে, নানান পরিচয়ে।

রাষ্ট্রনায়ক ও দিনমজুরের শ্বাসনালী যখন তখন কেটে দিতে পারে ওরা।

দক্ষিণের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রীকে জবাই করে দিল কিছুদন আগে। খ্রিষ্টমাসের আগের সন্ধ্যায়, উড়ান ভরা যাত্রীসহ গোটা বিমান দখল করে দেশ বিদেশ ঘুরিয়ে আকাশচুম্বী দাবি দাওয়া জানাল। এই তো কদিন আগে শ্রীমতী কুমারতুঙ্গাকে উড়িয়ে দিয়েছিল প্রায়।

বিভিন্ন বর্ণে বিভিন্ন ভূগোলে শস্ত্র-হাতে কোথায় নেই ওরা।

দাদাকে কেন নিয়ে গেল, কেন সতেরোটা বুলেট পাম্প করে দিল—স্পষ্ট নয়।

গত পরশু রাত সাতটায় দাদার শরীর, শরীর না শব, আনা হল বাসায়। দুদিন গেছে আইন কানুনু পোষ্টমর্টেম শবাগার বরফ—এসব নিয়ে।

দাদা, অর্থাৎ বিকাশ, বাবার জীবনবীমার মুষ্টিমেয় অর্থ খরচ করা ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনিয়ার শব্দটায় আরো আদিখ্যেতা, তবু তো ইঞ্জিনিয়ার। চার বছর বেকার। কোয়ালিফিকেশন লুকিয়ে টিউশনি। মার ফ্যামিলি পেনশনে গোটা সংসার। অদিতির কলেজ, আমার অর্থাৎ বিজনের ভার্সিটি।

আলথ্যুজার দেরিদা রোলাঁ বার্ত আমার পরিষ্কার। পদ্য গদ্য লিখি। মাসে-দুমাসে রেডিয়োর নিষ্ফল পড়ে আসি, অদিতির আবৃত্তির ক্লাশ—'জানো না কি চাঁদ—নীল কস্তুরী আভার চাঁদ—কিছু টাকা পায় এতে। জীবনানন্দের ক্রেজ চলছে।

মা-র পরিচয়টাও দেয়া ভালো। মা, অর্থাৎ বকুলবালা। বিধবা। ফ্যামিলি পেনশনার।

ছোট্ট দোতলা বাড়িটা নিজেদের, এই ভরসা। আমি ছিলাম উচ্ছল। পাঁচফুট এগারো। সবাই বলে চমক আছে। মদ খাই না। প্রেমিকা আছে। ক্ষোভও নেই। ফুরফুরে হাওয়া আছে। গ্যাসোলিন ভরে হাইওয়েতে উদোম জয়রাইডিং আছে ফুরিয়ে গেল টানাপোড়েন। আর কী লাগে?

অনেক কিছু জানি আমি। কবিতা ও পারমাণবিক বোমার রাসায়নিক সূত্র। কত কাগজেই আজকাল সব বেরোয় আমি। কেন অনেকেই জানে। তালিবানরা তালিবান কেন? ওসামা বিন লাদেন কোন ভুবনের নাগরিক? রণবীর সেনা সানলাইট সেনার শক্তির উৎস কী? জানা আছে জেহানাবাদ পালামৌ, নলবাড়ির মাটিতে কেন বা কাদের হিমোগ্লোবিন ঝরে, সব জানা আছে।

শুধু কদিন, থেকে, কিছুতেই মাথায় আসে না—রাশিয়ান বন্দুকে কী করে হত্যা হয় একজন ভারতীয় বিকাশের. নেহেরুর বুকের মার্জিত গোলাপ এত তাড়াতাড়ি বিবর্ণ হয়ে গেল?

আমার যে বড় ভাই—শান্ত ধীর সংযমী, মশারির ভেতর মশা পেলে যে মারে না। বলে, 'ওরাও তো বাঁচবে।'

রোগের জীবাণুবাহী প্রাণীদের জন্যেও যার মমতা—সে সীসা শরীরে নিয়ে কেন পড়ে থাকে লতায় পাতায়?

ওভারসিয়ার বলছিল, দাদার মৃত শরীর বন প্রাণীরা স্পর্শ করেনি। নখের দাঁতের আঁচড় ছিল না শরীরে। বুকে তলপেটে সতেরোটা ছিদ্র ছাড়া, যেগুলো মানুষ করে দিয়ে গেছে।

গত পরশুই তো, শব এনে নামান হল। মিনি ট্রাক বয়ে এনেছে। টাকা পয়সা দিতে হয়নি আমাদের, কে দিল কে জানে? কেউ দিতেও বলেনি। সরকারি খরচ বোধ হয়।

খরচ জানা ছিল না। নিষ্প্রাণ দাদা বাড়ি ফিরতেই কলরব। শোকের চেয়ে কৌতূহল বেশি। কান্নার কোরাস শুধু দুজনের—বকুলবালার, অদিতির। আত্মীয়রা ভরে দিয়েছে ঘরদোর। অদিতি মর্চোয়ারীর লোশন আর পচা মাংস। রিগর মর্টিস। দাদার বুকে যেতে চেয়েছিল। অনেকে আটকে দিল অজস্র ধূপকাঠি জ্বললেও কটু হাল্কা গন্ধ—

কি জগৎ জোড়া নাম—এ. কে. ফর্টিসেভেন। জ্বলন্ত সীসা বেরোয় না তো—বকুলবালার মতো কত মহিলার পরিণামহীন হাহাকার, অদিতির মতো উনিশে-যুবতীর বিলাপ বেরোয়। আমার কিছুই হয় না। কান্না না, হাহাকার না, কিন্তু ছটফটানি?

অবাক লাগে! বিস্ময় হয়। বিকাশ নামে পূর্ণ যুবকের হত্যায় নতুন কোন্ আলো দেখবে পৃথিবী? লক্ষ্য করি, আমাদের বাড়ি পেরিয়ে আরো দুটো বাড়ির পর অন্য এক সুদৃশ্য বাড়ির দোতলায় অবিরাম বাজে অডিও অ্যালবাম তখনও। বাড়িটার আদুরে নাম—শান্তনীড়।

শোক আর সংক্রামিত করে না কোনোকিছু, প্রমাণিত হয়।

মা-র কান্না দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে যায়। এক তো সন্তান নেই, দুই যা আরো তীক্ষ্ণ। দাদার চোদ্দমাসের রোজগারের এখানেই ইতি। সমান্তরাল দুটো কান্না মাকে দগ্ধ করে।

একেকটা মৃত্যু ও মৃত্যুজনিত কার্যকারণ বুঝিয়ে দেয়—Being is spontaneity! প্রথমবার বাবা, এবার দাদা। বাখতিন তো ক্যাটালিষ্ট।

বকুলবালার মতো আমার কান্না আসে না। অদিতির মতো হাহাকারও না। আমাকে শুধু অবুঝ করে দেয়। সদ্যকিশোর যেমন অবোধ হিংস্র হয়ে যায় কিছু না বুঝলে, আমিও। আনসিডিউল মৃত্যু আমাকে তাই করে দেয়।

ঘুরে ফিরে আবার ফ্যামিলি পেনশনের টাকা। দাদার চৌদ্দমাসের চাকরিতে একশ পঁয়ষট্টি লিটারের ফ্রিজ এসেছে। অদিতির বিয়ের দুটো গয়না হয়েছে। বসার ঘরে একটা লোমশ ডিভান অদিতির শখ, তাও হয়েছে,। আর আমার দু হাজার। দাদা নিয়ে বলেছিল, 'রেখে দে। যা খুশি কিনে নিস। সিগারেটটা কম খাবি। কড়া ব্র্যাণ্ড বদলা। বইমেলায় যাবি তো? রুচিরাকে (আমার প্রেমিকা) রেস্তোরাঁয় নিয়ে যাস। দেখিস তো—হকিং রেডিয়েশন কসমিক কিংবা আর্কিওলজির কোনো বই পাস কি না।'

আমি হেসে বলেছিলা, 'জরিপের মিস্ত্রির জন্য কসমিক আর্কিওলজি?' তোর জন্য ট্রেস পেপার আনব। হবে না?'

দাদা বলেছিল,—'কেন? পড়তে নেই?'

—'জরিপ-টরিপ নিয়ে তোর কারবার, হকিং দিয়ে কী করবি?

—'তাতে কি হল? পৃথিবীর কতো কিছুই এখন প্রত্নতত্ত্বের বিষয়। কবিতা লিখিস, বুঝিস না'?

এই দাদা রক্তাক্ত হলে কে না অবুঝ হয়?

বাবার হাড়ে বোনম্যারো ঘাটতি দেখা দেয়, দাদার তখন শেষ সেমিষ্টার। আমি অদিতি কলেজে স্কুলে।

বাবা এমন একটা বিভাগে মোটামুটি অফিসার যেখানে বেনোজলের মতো কাঁচাপয়সা। বাবার বজ্র কঠিন সততা-আদর্শ আষ্টেপৃষ্ঠে। যৌবনে প্রকাশিত বাবার মুদ্রিত কিছু কবিতার প্রতিলিপি দেখেছি। পেপারব্যাক কাব্যগ্রন্থ। কতো সফল কবি সাফল্যের মুখ দেখেনি। বাবার কোনো আপশোস নেই।

এখন কবি ও কবিতা নেই। দুটো ভান আছে। বাবা বলতেন, কবিতার জার্নি ফুরিয়ে গেছে কবে। তোরা লিখছিস, ভালো কথা। নতুন ভাষা খুঁজে নে।'

আমার এখনো মনে আছে, সেবার সুবর্ণরেখা ছবিটা দেখে দাদা আমি চুপচাপ বাড়ি ফিরে এলাম হাঁটতে হাঁটতে। ম্যাটিনি শো ছিল। অন্যদিন এমন সময় বাড়ি ফেরার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু সেদিন ফিরে এলাম।

অদিতি চা দিয়ে বলেছিল, — 'দেখেছিস?'

দাদা বলেছিল,—'হ্যাঁ। ঠিকই বলেছিস বিল্টু'।

এর বেশি দাদার কোনো কিছু বলার অভিরুচি ছিল না সেদিন। অদিতিই শুধু বলেছিল, 'ছবিটা বিষণ্ণ করে দেয় সবকিছু। আমার অনেক দিন মনখারাপ ছিল। বাবা আমি একসাথে দেখেছিলাম।'

অদিতির ফিল্মসেন্স প্রবল। 'এমোক' ছবিটা দেখে বলেছিল,—'এমন ছবি লাখে একটা হয় না, না রে ছোড়দা? সাউথ আফ্রিকার অন্তরাত্মা যেন তুলে এনেছে শ্যুট করে।'

বাবা বলতেন ভিন্ন কথা। আমি অদিতি তখন খুব একটা বুঝি টুঝি না। সোনার কেল্লা কিংবা এনকাউন্টার অব দ্য থার্ড কাইণ্ডে আমরা সীমাবদ্ধ। দাদার সাথে, শুধু দাদাকে কেন, অদিতি ও আমাকেও বোঝাতেন। না, বোঝাতেন না। কাউকে কিছু বলে বোঝানের রীতি আমাদের পাঁচজনের সংসারে ছিল না।

বলা হত। তেমনি বাবা বলতেন,—'চলচ্চিত্রের কিন্তু মারাত্মক লিমিটেশন রয়ে গেছে, তুই যাই বলিস না কেন বিকাশ।'

আমরা শুনতাম। দাদা জবাবে বলত,—'অডিওভিসুয়ালের এমন সিনক্রোনাইজেশন আর কোনো মিডিয়াম দিতে পারে না, বাবা।'

বাবা বলতেন,—'তা হোক। ক্যামেরা যতটা দেখাবে দেখতে হবে। সাউণ্ডট্র্যাকে যা রেকর্ডেড হবে তাই শোনা যাবে। আর লেখায়? অনেক অদেখা ভিসুয়াল ধ্বনি, নাটক, এমনকি ঘ্রাণও ধরা দেবে। অনুভূতিকে এক্সটেণ্ড করে দেয় প্রিন্ট মিডিয়া। কুরোশাওয়ার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।'

এমন কথাবার্তা শুনে অদিতি বলত, —' ছোড়দা, কিছুটা বুঝলি? না মাথার উপর দিয়ে পিছলে গেল সব?'

আমি বলতাম, — 'কিছুটা ধরেছি। বাকিটা তুই ধরে রাখ রে মারী সিটন।'

অদিতির আবার খোঁচাখুঁটি,—'তোর আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্টেনা আরে উপরে তোল না। ঐ দেখ লম্বা বাঁশ আছে।'

কোন দিন সন্ধ্যায়, যেদিন দাদা হোস্টেল থেকে ফিরত, বাবা তাড়াতাড়ি অফিস সেরে আসতেন, অদিতির আবৃত্তির ক্লাশ থাকত না, হয়তো শনিবার। মা প্রচুর জলখাবার বানাতেন।

আমায় বলতেন,—'সন্ধ্যায় কোথাও বেরুবি না বিজু, সবাই বসবে।'

সবাই মানে, বাবা দাদা মা অদিতি আমি। আমাদের সংসদ। বাবা মাকে বলতেন,—'এই যে শ্রীমতীজি, আপনার এক আধটা গান দিয়ে অধিবেশন শুরু হোক না।'

মা-র প্রথমে আপত্তি তারপর গাইতেন শান্তিদেব ঘোষ কিংবা কাননদেবীর খুব পুরোনো গান। একসময় অদিতি গলা মেলাত। আলো চলে গেলেও অসুবিধে নেই। অদিতি রঙিন মোম জ্বেলে দিত কয়েকটা। অদিতির পরিপাটি বেশি।

বাবা সিগারেটে আগুন দিতেন। আমি ধোঁয়ার গন্ধে উসখুস করতাম লক্ষ করে মা বাবাকে অনুযোগের সুরে বলতেন, 'ওটা নেভাও। বিজুকে দেখ না। সিগারেট ধরেছে—জানো?'

—'তাই নাকি রে? কম খাবি। এ বয়সে আমিও ধরেছি।'

দাদা অদিতিকে মা বলতেন,—'তোমরা দেখলে বাপের শাসন?' ওরা হাসত।

বাবা কবিতা আবৃত্তি করতেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে। অদিতি জীবনানন্দ, শঙ্খ ঘোষ। আমি লীভস অব গ্রাস, অ্যাশ ওয়েডনেস ডে। দাদা গুলাগ আর্কিপেলাগোর কিছু কিছু অংশ। প্রায়ই পড়ত ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্।

অদিতি বনলতা সেন পড়তে চাইত না। বলত,—'যে যার যেমন খুশি গান গেয়ে, আবৃত্তি করে সুন্দর কবিতাটার দফারফা করে দিয়েছে।'

বাবা বলতেন,—'কেন কেন?'

—জানো না তো। সেদিন ফাংশানে একটা মেয়ে — এতোদিন কোথায় ছিলেন— এমন টোনে বলল— বনলতা সেন যেন সিটিবাস থেকে নেমে জীবনানন্দের মুখোমুখি — ফুটবোর্ডে দুজনে দেখা—কণ্ডাকটার তাড়া দিচ্ছে তাড়াতাড়ি নামতে।

বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন,—'বলুক না যে যার মতো। তুই কিভাবে বলিস সেটাই বড়ো কথা। মেয়েটাকে তো ক্লাশে নিয়ে যা।'

আমি চটাতাম,—'ও আর কী বলবে বাবা? চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশার মতো বসে আছে। দে দে সশের বোতলটা দে।'

অদিতির ধমক—'ছোড়দা?'

দাদা বলত, —'তোদের শুরু হয়ে গেল। বিজু, প্লিজ। বল না বিল্টু তুই কীভাবে বলতিস?' আমি বলতাম, 'লবঙ্গলতা সেন, বলেন না এতদিন কোথায় ছিলেন?'

—'ছোড়দা, আবার?'

দাদার অনুনয়, —'বিজু থাম না। তুই বল তো রে। বিজু কবিতা লিখলেও তোর কবিতার বোধ বেশি, আমি জানি।'

নিজের পাল্লা ভারি দেখে অদিতি উৎসাহে বলত,—'প্রথম কথা হচ্ছে গোটা কবিতা জুড়ে চোরা বিষণ্ণতা রয়ে গেছে। ঠিক তো? এতদিন কোথায় কোথায় ছিলেন—উচ্চারণে অবসাদ ক্লান্তি বিষণ্ণতা থাকবেই। অ্যাতো ক্যাজুয়ালি বললে চলবে কেন? জীবনানন্দের কোনো শব্দ ক্যাজুয়াল নয়।'

বাবা চমকিত হয়ে বলতেন,—'বাপরে! আমাদের বিল্টু অথরিটি হয়ে গেছে যা বললি লিখে রাখিস না কেন?'

অদিতি কোনদিন লেখেনি। শুধু আবৃত্তি করত সুরেলা ভরাট সফিস্টিকেটেড।

আর এভাবেই আমাদের সান্ধ্য-সংসদের ঘরোয়া অধিবেশন চলত। বাবার বোনম্যারোর ঘাটতি অধিবেশন নষ্ট করে দিল একদিন।

অদিতি ঠিকই বলে, আমার মগজে আলট্রা হাইফ্রিকোয়েন্সি অ্যান্টেনা আছে। গর্ব না। তবু, বিমান ছিনতাই-র সংবাদ এক নাগাড়ে প্রচারিত করে, বিভিন্ন নেতা-মহানেতার উদ্বেগ বিজ্ঞাপিত করে, বুলেটিন শেষ করার একটু আগে মেলবোর্ণ ক্রিকেটের খবর কেন জুড়ে দেয়া হয় দূরদর্শন ও বেতারে—আমার অ্যান্টেনায় কারণটা ধরা পড়ে না স্পষ্ট। রাষ্ট্রীয় উদ্বেগ সংকট কি আর সর্বজনীন নয় মিডিয়ার বিচারে।

দাদার মৃত্যুর খবর স্থান পেয়েছিল স্থানীয় কয়েকটা খবরের কাগজের তৃতীয় পৃষ্ঠায়।

শ্মশানে অনেকেই ছিল। শ দেড়শ হবে। মাতালের হুল্লোড়ও ছিল। শেষরাতে পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে গেল। যার প্রিয় উপন্যাস ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্,তার বুলেটবিদ্ধ দেহ ছাই হয়ে গেল লকলকে আগুনে।

দু-একজন বলছিল, অস্থি আনতে। পরে গয়া এলাহাবাদ আছে। আমি বাধা দিয়েছিলাম, লাগবে না। কোনো মানে নেই। বাবার অস্থি দাদা আমি আনিনি। শোকের আড়ম্বরের চেয়ে করুণ আর কী হতে পারে?

মানবিক প্রবৃত্তির প্রাচুর্য থাকলেও আমাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা কম। এ নিয়েই বাবাকে চেন্নাই ঘুরিয়ে আনা হল। মার গয়নার বাক্সের খোপ তখন গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন শুকনো ধুলোময়।

বিরসমুখে ফিরে আসা চেন্নাই থেকে। দাদা, পিশেমশাই বাবাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাওয়াই সার।

মার হাতের শেষ একগাছি বালা নাড়াচাড়া করতে করতে পাশে বসা মাকে বাবা বলেছিলেন,

—'বকুল, আর না।'

—'কী না?'

—'ফুটো কলসিতে জল। গয়নাপত্র সব গেল। বিল্টুর জন্যে কিছুই রইল না।'

কথা শুনে মা-র ছুটে যাওয়া অন্য ঘরে। টানা টানা রক্তিম চোখ, ভেজা গাল। শাড়ির খুঁটে আগত শোকের বিষবাষ্প মুছে ফেলা বকুলবালার—এইসব দিনানুদিনের পুঙ্খানুপুঙ্খ এ. কে, ফর্টিসেভেনের চালনাকারী জেনেছে কি?

অদিতি বাবার কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছে দিয়ে বলত, — 'জল খাবে?'

না রে।'

'কি খেতে মন চায় বলো না, বাবা?'

—'খেতে শুতে আর মন নেই রে বিল্টু।'

—'তুমি ভালো হয়ে যাবে দেখে নিও।'

—'ফুটো কলসির জলে কদ্দিন চলে রে, মা?'

—'কবিতা লিখেও এতো হতাশ তুমি?'

—'কেন, এমন বললি বল তো?'

—'কবিতায় স্বপ্ন থাকে। হতাশা থাকলে কবিতা কবিতাই হয় না। তোমার সব লেখা পড়েছি আমি আর ছোড়দা লুকিয়ে লুকিয়ে।'

—'পড়েছিস? কী মনে হয়েছে তোর?'

—'যে কবি এত স্বপ্ন দেখায় তার মুখে ফুটো কলসির উপমা মানায় না!'

—'স্বপ্ন তো ফুরিয়ে যায় রে বিল্টু!'

—'না, স্বপ্ন কখনো ফুরোয় না বাবা।'

দাদা বাবার আদরের ডাক বিল্টু।

মৃতপ্রায় বাবার শিয়রে সোনালি ডানার চিল কিংবা ধানসিঁড়ি নদীর জলোচ্ছ্বাস টেনে আনার অদিতির প্রয়াস—বাবার চোখে জল আনত কেবল।

আঁচলে বাবার চোখ মোছায়। অদিতির পরিচর্যা। বাবার আবার হয়তো ক্ষীণ ডাক—'বিল্টু'

—'কী বাবা।'

—'বিজুকে বলিস তো।'

—'কী?'

—'একদিন যেন মীর-তকী-মীর শোনায়। না না জিব্রান। এত সুন্দর উচ্চারণ ও শিখল কোথায়?

—'বলব। ছোড়দা শোনাবে।'

আমি তখন পাশের ঘরে নির্বাক।

আমরা সবাই একই ঘরে সে রাতে। এগারোটা দশে হৃদপিণ্ড জানান দিল—আর পারবে না।

গেস্‌পিন্‌ শুরু হয়েছিল দশটার পর।

আমাদের পারিবারিক ডাক্তার বাবার কব্জি ছেড়ে মাথা তুলে ছোটমামাকে বললেন—'সরি!' বাবা চলে গেলেন।

এরপর বকুলবালার গান আর কোনদিন শোনা যায়নি এ বাড়িতে।

এভাবেই চলছিল সবকিছু। চলেও যেত। দাদার চাকরির পর এত দিনের একটানা গুমোট কেটেছিল কিছুটা।

অদিতিকে শিলিগুড়ির ওরা দেখে গিয়েছিল। যে নিজেরা দৃষ্টিশক্তি জলাঞ্জলি দিয়ে দেখতে আসবে সে-ই নাকচ করবে ওকে। পন টন নেবে না। কথা প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল, ছেলে দাদাকে সরাসরি বলে গেছে।

পাঁচফুট সাত ইঞ্চির দীর্ঘ সুশ্রী অবয়ব। মুখে শান্ত অথচ সুদৃঢ় আকর্ষণ। গায়ের রঙে জ্বলন্ত মোমের দ্যুতি। নিজের বোন বলে গর্ব না। যে কেউ দেখলে মুগ্ধ হয়।

প্রায়ই লেগ্‌পুলিং করতাম—'আবৃত্তি-টাবৃত্তি ছাড়। না বুঝে খামোকা ঘ্যান ঘ্যান করিস। বরঞ্চ সুপারমডেল হয়ে যা।'

—'কী মডেল?'

—'সুপার মডেল। ষ্টেজে ক্যাটওয়াক করবি। বড় বড় ম্যাগাজিনে তোর বোকা বোকা হাসির ছবি বেরুবে।

—'ছবি?'

—'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছবি। লঙ্কা হলুদ জিরে গরম মশলার গুড়োর, বা ধর একবার ধুলে কাপড়চোপড় ফ্যাকাশে এমন ওয়াশিং পাউডারের বিজ্ঞাপন দিবি দাঁত বের করে।'

—'তোর এত বুদ্ধি ছোড়দা! দেখি দেখি, ওটা আছে এখনও না খসে গেছে। মনে তো হয় আরো একটা গজিয়েছে।'

ও দেখত, মানে দেখার ভান করত আমার কোমরের পেছন।

ভীষণ স্মার্ট অদিতি। বলত, ডামিটিতে মাস মিডিয়া পড়বে। কলেজে ছিল ইংলিশ অনার্স। সুন্দরী। মা-ও সুন্দরী। মা-র চেয়েও বেশি। গর্ব ছিল। আমার বোন বলেই বলতে দ্বিধা নেই। যে কোনও বাড়িতে এমন মেয়ে থাকলে গর্ব ও দুশ্চিন্তা থেকে যায় বাড়ির লোকের। আমাদেরও ছিল।

অদিতি, মানে বিল্টুর সাথে এমন খুনসুটি চলল—বাবা তখনও আছেন পূর্ণ সজীবতায়। দাদার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এক একবছর।

বকুলবালার গলায় গান ছিল তখনও—'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।'

দিন গেল না। কোথাও সবদিন একভাবে যায় না।

দাদার চোদ্দমাসের চাকরিতে কোনো সঞ্চয় নেই। থাকবে কেন? বাবার উপার্জন-সঞ্চয়, মা-র গয়না শুষে নিয়েছে বোনম্যারো আর দাদার শেষ কয়েক মাসের প্রযুক্তিপাঠ।

এখন ভরসা মার পেনশন মাস মাস। আমার টিউশনিতে আর কত হয়? আরো কয়েকটা না হয় ধরা গেল। অদিতির আবৃত্তির ক্লাশ? দাদার মৃত্যু-জনিত যে হাহাকার উঠেছে অদিতির গলায়—

সে গলায় আবৃত্তির সাবলীলতা আবার কি ফিরে আসবে কোনোদিন?

এক দিনে আমার প্রিয় সুপার মডেল পুরোপুরি ঝরে গেছে। ওর শখের বিরাট ডিভানে কয়েক আস্তর ধুলো। কেউ ঝাড়পোছ করে না।

বাবা-দাদার বিল্টুকে জাগাতে হবে। পুনঃস্থাপিত করতে হবে। কিন্তু, কীভাবে? একে অপরকে পরিচর্যার কৌশল আমরা ভুলতে বসেছি।

মানবিক সঞ্চয়ের পূর্ণতাও কি ফুরিয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত? এখানেও কি টান পড়ে গেল?

অদিতি অসহনীয় নিরুত্তাপ হয়ে গেছে। দাদার ব্যবহৃত কোট নিয়ে গন্ধ শুঁকছিল গতকাল। দেড় ইঞ্চি পরিমাণ একটা মাত্র চুল লেপ্টে আছে কোটের কলারে। অদিতি যত্নে তুলে নিয়েছে। কোথায় রাখল কে জানে।

মা-র দুচোখে দুধরনের অভিব্যক্তি ঝরে—সন্তান হারানো আর আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা।

এত কম অঙ্কে কোন পরিবার ভদ্রভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। ক্যামোফ্লেজ পোশাকধারী, ওদের তো জানা ছিল।

রাতের আকাশে নক্ষত্রের হাট দেখিয়ে যে মানুষটা আমাদের প্যারাডক্স অব ইনফরমেশন বোঝাত অতি সরল ভাষায়, ওর তলপেটে সতেরোটা বুলেট! যার শিয়রে বড়াইলের ঝোপঝাড় পাথর অরণ্য! যে প্রায়ই বলত, —'যাই বলিস না বিজু'

—'কী?'

—'কত জায়গায় পাহাড় দেখেছি আমরা। সহ্যাদ্রি আরাবল্লী বিন্ধ্য মহাকাল, কিন্তু বড়াইল যেন বড়াইল। এমন পাহাড় হয় না আর।'

এই বড়াইল জরিপ করতে করতে দাদা এখন কোথায়?

এই তো সেদিনও বলেছিল, 'কলকাতার ট্যুর পড়বে আগামী মাসে। ভালো কয়েকটা বই আনব—নাম লিখে দিস তো।'

আমি মনে মনে নাম লিখে রেখেছিলাম। স্টান র‍্যাফট্, ক্যান্সার ওয়ার্ড, জো উইন্টারের রবীন্দ্র অনুবাদ। অদিতির বেনারসীও আনার কথা ছিল। কাঁকুড়গাছির সেজো কাকিমা পছন্দ করে দিতেন।

কিছুই হয়নি। কত প্রত্যাশা মাঝ পথেই বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়, কোন আয়ুধ তা জানে না।

দাদার মুখাগ্নি নিয়ে বিতণ্ডা হয়েছিল শ্মশানে। আমি বাধা দিয়েছি। একটা মৃতদেহ নিয়ে এত টানা পোড়েন কেন? যে কোনো প্রত্যঙ্গে আগুন দিলেই তো হল। দাহটাই বড় কথা।

অথবা, দেহটা ফেরত দিলেই হয় তাদের—যারা নিষ্প্রাণ করেছে। নিজেদের সুকৃতির স্যুভেনির বয়ে বেড়াক।

দাদার বন্ধুরা চার পাঁচজন রোজ দু-বেলা আসে। মা-র পাশে বসে। টুকটাক কথা হয়। সবাই ঠিক আছে, একটা অন্যরকম।

অদিতির কাঁধে হাত রেখে কী বলতে চেয়েছিল অদিতিরই ঘরে। সমবেদনা? বিধ্বস্ত অদিতি শানিত চোখে দেখেছিল ওকে। ভীতু বিড়ালের মতো কুঁকড়ে গিয়েছিল দাদার শোক-সন্তপ্ত বন্ধু। আমি ওকে দলামচা করে দিতাম। প্রয়োজন হয়নি। অদিতি একাই যথেষ্ট।

আবার বিতণ্ডা হয়েছে দাদার শেষ কাজ ঘিরে। আত্মীয়রা যার যা মতামত আছে উজাড় করে দিল। এত শাস্ত্রজ্ঞ সবাই। অপঘাতে মৃত্যুর চারদিনে নাকি ক্রিয়া। সে তো পেরিয়ে গেছে কবে। আবার বিশেষজ্ঞদের কাছে ছোটাছুটি। কারো কোনো স্পষ্ট রায় নেই। অবিশ্বাস্যভাবে সব কিছুর অবসান করে দিয়েছিলেন বকুলবালা,—'ওর কিছু টাকা আছে আমার কাছে জমানো। ওগুলো বিলিয়ে দে বিজু, তুই যেখানে ভালো মনে করিস। আর কিচ্ছু লাগবে না।'

এক বয়স্ক আত্মীয়া প্রতিবাদ করেছিলেন, 'কী বলছ বকুল। আত্মার শান্তি কি হবে ক্রিয়াকর্ম ছাড়া?'

বকুলবালার শান্ত দৃঢ় অথচ বুকভাঙ্গা জবাব ছিল—'কিসে বিকাশের শান্তি, আমি ভালো জানি।'

দোতলাসহ ছোট্ট একটা বাড়ি আমাদের। শহর থেকে একটু দূরে। এ অঞ্চলটা এখনো কিছুটা ফাঁকা। বাবা বানিয়েছিলেন তিলতিল করে। বেশ কয়েক বছর লেগেছিল শেষ করতে।

দোতলায় বারান্দাসহ পাশাপাশি দুটো ঘর। দাদার আমার।

গৃহপ্রবেশের পরদিন এক চিলতে কাগজে কিছু লিখে বাবাকে দিয়েছিল অদিতি। বলেছিল,

—'আয়তাকার ষ্টিল প্লেটে লিখিয়ে এনে দিও তো বাবা। কী লিখতে হবে, কাগজে লিখে দিয়েছি।'

—'কী রে এটা?'

—'কী আবার। বাড়ির নাম। নাম দেবে না?'

—'কী নাম—দেখি দেখি। বাবার উৎসাহ ছিল। অদিতি চিরকুটটা পড়ে ছিল—'সিন্ধুসারস।' বাবা এনে দিয়েছিলেন। উঁচু বারান্দায় উঠতে প্রথমে যে সিঁড়ি, তার লাগোয়া পিলারে গেঁথে দিয়েছিল অদিতি বাড়ির নামাঙ্কিত ফলক।

বাবা বলেছিলেন,—'জীবনানান্দর এমন ফ্যান আর কোথাও নেই বোধ হয়।'

দুটো বাড়ির পরের সুদৃশ্য বাড়িটায় বাজছে একটানা সি. ডি.—পুরনো হিন্দি গানের অশ্লীল রি-মিক্স।

দোতলার বারান্দায় বসে আছি একা। দাদার ঘর বন্ধ। শোকও এমন! ফিকে পড়ে যায়। আজ রান্না হয়েছে। রাতে আমরার তিনজন খেতে বসেছিলাম। আমি কিছুটা খেয়েছি। মা অল্প। অদিতি আঙুলে ভাত নেড়েছে। মুখে দু এক দানা দিয়েছে হয়তো, খায়নি।

অদিতি কি তলিয়ে যাবে? বিষণ্ণতা তো চোরাবালির মতো। একবার ছিটকে পড়লে আর কথা নেই। কেউ টেনে তুললেও ওঠা যায় না। তলিয়ে যাবে। অদিতিও কি? নাঃ। ওকে তুলতে হবে, তুলতেই হবে।

আমি নেমে গেলাম অদিতির ঘরে। ডাকলাম, —'অদিতি?'

ও নিজের বিছানায় বসে আছে। সামনে খোলা জানলা। একটু হাওয়া, শীতের শেষ। বাড়িটা শহরের বাইরে তাই আপাতত নীরব। ফুলের বাগানের পর খোলা মাঠ। অন্ধকার। অনেক দূরে হাইওয়ে। ছুটন্ত ট্রাকের আলো, ক্ষীণ শব্দ।

ও মুখ ঘোরায়, আমাকে দেখে। বলে,—'আয় ছোড়দা। ভেতরে আয়।'

আমি ভেতরে যাই। বসি অদিতির পাশে। ওর দৃষ্টি আবার বাইরে। আমি বলি,—'কী করছিস অদিতি। ঠাণ্ডা, আসছেরে। জানলাটা বন্ধ কর। কী ভাবছিস বসে বসে!'

অদিতি মাথা নাড়ে—'কিচ্ছু না।'

—'খেলি না কেন র বিল্টু?'

আর এখানেই আমার ভুল হয়ে যায়। বিল্টু ডাক মানেই বাবা ও দাদা।

ওর চোখ টলমল। ডাকে—'ছোড়দা!'

—'কী অদিতি?'

—'গন্ধ রে।'

—'কোথায়?'

—'কোটে। ঐ কোটে।'

—'কিসের গন্ধ?'

—'দাদার। এখনো আছে। তুই শু'কে দ্যাখ!'

অদিতির গলায় আবার হাহাকার, আমার বুকে মাথা রাখে সুপার মডেল—বাবা দাদার বিল্টু।

এ. কে. ফর্টিসেভেন কি এতসব বোঝে?

কোজাগরির রাতে হিড়িক পড়ে যেত বাড়িতে। মার শখ—সারাদিন উপোস, টুকটাক এটা ওটা বানানো। সন্ধ্যেবেলা পুরুতমশাইর পাঁচালি পড়া। মার পুজোর ঘরের সীমানা ছাড়িয়ে বাড়িময় আজমীরি ধুনোর গন্ধ, শঙ্খের ধ্বনি।

বাড়ি সরগরম। আত্মীয়-স্বজন যাকে পেতেন বাবা বলে আসতেন। মার পেছনে পেছনে সারাদিন অদিতিও। উপোস করেও সবাইকে ফরমায়েশি চা দিত ঘনঘন।

আমি চটাতাম,—'এই ছুঁড়ি, না খেয়ে গ্ল্যামার ঝরে যাচ্ছে তোর। খেয়ে নে। বকুলবালাকে বলব না।'

আকাশে শরতের জ্যোৎস্নাময় চাঁদের পূর্ণায়ত ছবি। দোতলার বারান্দায় আমি ও সিগারেট। সবাই নিচে হুল্লোড়। বাবা জোড়া ইলিশ আনতেন। বলতেন,—'নৈহাটির বাড়িতে ছোট জেঠু তিন-চার জোড়া আনাতেন কোজাগরির বিকেলে। তোরা দেখিসনি।'

কোজাগরির রাত মানে সুপার মডেলের সিন্ধুসারসে কারনিভাল।

মহালয়ার ভোরেও ছিল ছোটখাটো উৎসব। আগের দিন মা মিষ্টি আনাতেন। পরদিন যে-ই আসবে খালিমুখে যাবে না। পুজোয় প্রায় প্রতিবছর বেরিয়ে পড়া। আগষ্টের শেষে রেলে রিজার্ভেশন। কোনোবার পালামৌ রাঁচি চাইবাসা, কোনোবার নাসিক পুনা বোম্বে। সেবার তো দক্ষিণে রামেশ্বরম পেরিয়ে, আরো দক্ষিণ-পূর্বে বে অব বেঙ্গলের তট ঘেঁষে। এটাই নাকি মেনল্যাণ্ডের কেপ পয়েন্ট, শ্রীলঙ্কার আকাশে মেঘ দেখা যায় অস্পষ্ট।

অদিতির সালোয়ার, ওড়না গলায় জড়ানো। মাথায় বারমুডা ক্যাপ—চুল দামাল। ভীষণ হাওয়া। মা-র কাপড় প্রায় উড়ে যায়।

বকুলবালার কপট আক্ষেপ—'কোথায় নিয়ে এলে তোমরা। বিকেল অব্দি এখানে দাঁড়ালে শুকিয়ে শণ হয়ে যাব রে বিকাশ।'

বালুর তটে অদিতির উচ্ছলতা। ঝিনুক কুড়ানো।

আমাদের ভ্রমণের দিনলিপি ওরা কি দাদার কাছে শুনছিল? ওরা কি বলতে দিয়েছিল কোজাগরির জ্যোৎস্নায় কেমন জীবনমুখী হয়ে যেত বিল্টুর সিন্ধুসারস?

দেয়নি। কেউ কারো কথা শোনে না এখন। পাহাড় বনের গাছ-গাছালি অজস্র ডালপালা মারণাস্ত্রের ব্যারেল যেন। মানসিক সব ভাষা কবে অচল হয়ে গেছে। বর্তমানে হিংস্র গন্ধ ও বিস্ফোরণের প্রতাপ ছারখার করে দিয়েছে সব।

ভ্রমণের দিনলিপি, দিনানুদিনের রোজনামচা কে শোনে এখন?

আমার ভুল হয়ে গেছে। অদিতিকে চোরাবালি থেকে টেনে তুলতে আরো অতলে তলিয়ে দিয়েছি। দাদার কোটের গন্ধ, একটা তুচ্ছ চুলকে পাথেয় করে রেখেছে ও। বাবার মৃত্যুর পর মনে হয়েছিল, সব শুকিয়ে যাচ্ছে। দাদার পর মনে হচ্ছে আর শুকোবারও কোনো কিছু অবশিষ্ট নেই।

চোখের জল না ফেলেও কেমন যে কঁকিয়ে ওঠে অদিতি। ও কি হারিয়ে যাবে? তলিয়ে যাবে? নারে বিল্টু। তোকে টেনে তুলব। বের করে আনব। তোকে আমার মতো অবুঝ একরোখা করে দেব। এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কোনো শান্ত শব্দ তোকে নিরাময় করতে পারবে না। তোকে রাগি, বদরাগি করে তুলতে হবে। সিংহ সদৃশ ক্রোধ ভেতরের সব কষ্ট ভুলিয়ে দেবে, দেখিস। তোকে রাগাতে হবে।

আমি সিগারেট ছুঁড়ে দিই বাইরে। নিচেরতলায় বকুলবালা ও অদিতি—কে কী করছে কে জানে। আমার ঘুম হয় না।

সহজ, অতি সরল কিছু প্রশ্ন তাড়া করে— আমরা কোথায়? এখানে আমাদের মতো মানুষের ভূমিকা কী? আমাদের নিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তা কে বা কারা দেবে? নিরস্ত্র আমাদের হত্যা করে কার কতটা লাভ? আমাদের শোক তাপ সর্বজনীন নয় কেন? দাদার শেষকৃত্যের দিনেও কেন পাশের বাড়িতে অবিরাম বাজে বাবা সয়গল? আমাদেরই মধ্যবয়স্কা নিকটাত্মীয়ের মুখে কৃত্রিম কান্নার ছায়া কেন? আমার মগজের আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েনি অ্যান্টেনায় সব ধরা দেয় শুধু, এই কয়েকটা সহজ স্থূল প্রশ্নের উত্তর ছাড়া।

আমি আবার সিগারেটে আগুন দিই। বড়ো একফোঁটা রক্তবিন্দুর মতো সিগারেটের আগুন জ্বলে অন্ধকারে। পারমাণবিক ধোঁয়ার মতো আঁঠালো বায়বীয় নিকোটিন প্রবিষ্ট হয় আমার দুই ফুসফুসে। আমার স্নায়ু অস্থিরতায় আরো টনটন করে। একটা প্রত্যয় বারবার ঘুরে ফিরে আসে, দাঁড়াতে হবে। দু পা ফাঁক করে, কোমরে দু হাত রেখে বলিষ্ঠ ছ ফিটকে রুখে দাঁড়াতে হবে, একা। আর তো কেউ নেই। কিন্তু আমার া প্রতিবাদী উঠে দাঁড়ানোকে কে স্পনসর করবে? যেখানেই যত ক্রিয়াকলাপ হয় আজকাল, সব ঘটনার পেছনেই পৃষ্ঠপোষক থাকে।

দিন পেরিয়ে যায় অনেকটা। নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর প্রতি ঘণ্টায় ষোলোশ কিলোমিটার আবর্তন থেকে বা কমে যায় না কখনো। পৃথিবী জুড়ে নতুন মিলেনিয়ামের ভুল হিসেব শুরু হয়ে গেছে। নিরানব্বই বছরে একটা শতাব্দীর পূর্ণতার হাস্যকর বিজ্ঞাপন সব ধরনের মিডিয়ায় প্রচারিত হচ্ছে। সব চলছে। আমাদের অবশিষ্ট তিনজনের জীবনও। খেতে বসে অদিতি আজকাল কিছুটা খায়। আমি আর বলতে পারি না — 'বেশি করে খা না। গ্ল্যামার খসে যাচ্ছে।' এসব বলার দিন অতিক্রান্ত।

অদিতি আপত্তি করে না আর। স্বরের সৌষ্ঠব যেন পেরিয়ে গেছে। কয়েকটা ছেলেমেয়ে ওর কাছে পড়া বুঝে যায়। অদিতিও ফাইনাল দিয়েছে। পরে ইউনিভার্সিটি যাবে কি?

গম্ভীর হয়ে গেছে ভীষণ। যখন বাড়িতে থাকি আগের মতো তাগাদা দিতে হয় না। চা এমনি এনে দেয়। ওকে রাগাতে পারিনি। কিছুই করতে পারিনি। ও যেন গলা অব্দি নিমজ্জিত চোরাবালিতে। ওর সুডৌল ঝকঝকে দাঁতের সারি কতদিন দেখিনি, হাসলে তো!

কোনো কথা বলে না। একটা, বেশি হলে দুটো শব্দে জবাব দেয়।

মা খিটখিটে হয়ে গেছেন। কোনো কিছু বললে ভুলে যান। পরে হয়তো মনে পড়ে। সেদিন বাজার থেকে ফিরতেই ব্যাগটা ভেতরে নিয়ে খুললেন সব। হঠাৎ চেঁচালেন জোরে,—'এই বিজু!'

—'কী গো?'

—'এতোগুলো মটরশুঁটি আনতে কে বলেছে তোকে?'

—'তুমিই তো বললে মা।'

—'আমি বলেছি? অসম্ভব। বলিনি।'

আমি নম্রস্বরে বকুলবালাকে শান্ত করি—'যা-যা বলেছ এনেছি। মটরশুঁটিও বলেছিলে।'

—'অ! বলেছি? বলতে পারি, বলতে পারি। শোন, আর আনিস না। আলুপনির মটরশুঁটির ডালনা বিকাশের খুব প্রিয় ছিল রে। তোদের বাবারও । এসব আর আনা চলবে না।'

বকুলবালার গলায় দূরে কোথায় অনেক আগে হারিয়ে যাওয়া শান্ত বিকেলের হাল্কা বিষণ্ণতা।

তারপর মুখ তুলে জোরে ডেকে উঠলেন, কর্কশ—'অদিতি, এই অদিতি। কোথায় তুই?'

ডাক শুনে অদিতি ছুটে এল।—'কেন মা? কী হয়েছে?'

—'আমার মাথা হয়েছে। ওগুলো ছুঁড়ে ফেলে দে বাইরে। ফেলে দে। দাঁড়িয়ে দেখছিস কী হতভাগী? বিজু জানে না, নিয়ে এসেছে।'

সব মটরশু'টি আমিই ফেলে দিয়েছিলাম বাইরে। তারপর আমরা মূহ্যমান হই।

আমি ভার্সিটি যাই না। টিউশনি নিয়েছি সাতটা। কম্পুটার শেখাই। ডি. এ. বাড়ায় মা-র পেনশন কিছুটা বেড়েছে। আমাদের এমনভাবে চলছে, না চলার মতো। রিফ্যু করার আর্ট অদিতি কী করে যেন শিখে নিয়েছে। হেঁসেলও।

আমি সিগারেট কমিয়ে দিয়েছি যতটা পারি। চা অল্প। ঘরে আলো পাখা চালাই না। টেলিফোন কোথাও করি না। বাজলে ও প্রান্তের কথা শুনি। বাবার আনা ফোন মার এক হাজার টাকায়। এখন ও প্রান্ত থেকে কেউ বাজালে বাজে, আমরা বাজাই না।

মা-র দৃষ্টি ঘোলাটে ভাষাহীন হয়ে যাচ্ছে। অদিতিও লক্ষ করেছে। মা-কে নজরে রাখে সব সময়। বকুলবালাকে রাতে এল প্রোজোলামের কড়া ডোজ দিই। হয়তো ঘুমোন। অদিতি খাপছাড়া ঘুমোয়, উপরতলা থেকে আমি টের পাই সব। আর আমি অসহায় পুষতে থাকি ক্রোধ।

দাদার বন্ধুরা আর আসে না। বিড়ালশাবক আসতে চেয়েছিল একদিন। গেটের বাইরে ওকে ভালো কথায় বিদায় দিয়েছি। আর আসেনি।

মা কখনো স্বাভাবিক কখনো অন্যরকম। অস্বাভাবিকও নয়।

সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে দোতলায় আমার ঘরে বসে আছি। হাতে দিনের চতুর্থ সিগারেট। অদিতি চা দিয়ে গেছে। এখন নিজের ঘরে চারটে ছেলেমেয়েকে পড়াচ্ছে। আমার ঘর অন্ধকার। পাশের বাড়ির দোতলার ও রাস্তার নিওনের আলোয় ঘর আলোকিত কিছুটা। পাকা সিঁড়িতে পায়ের নরম শব্দ। খালি পা কেউ আসছে। এ সময় আবার কে? অদিতি? না। ওতো নিচে পড়াচ্ছে।

দরজায় ছায়া। মা। মা এখানে কেন?

—'অন্ধকারে বসে আছিস কেন রে বিজু? আলো কোথায়?'

—'থাক না। বেশ তো লাগছে?'

—'কী যে বলে। সন্ধ্যেবেলা ভূতের মতো অন্ধকারে?'

মা স্যুইচ টিপলেন। রকমারি দুটো বাহারি আলো জ্বলে উঠল—অদিতির ইন্টিরিওর ডেকোরেশনের চিহ্ন কোনো এক সময়ের। আমি বললাম,—'হঠাৎ দোতলায়? কিছু বলবে?'

—'হ্যাঁ। তাই তো এলাম তোর কাছে। দ্যাখ না।'

—'কী দেখব?'

—'চিঠি।'

—'চিঠি? কার?'

—'ওদের।'

—'ওদের?'

—'হ্যাঁ, ওদের। বিকাশের অফিসের।'

—'দাদার অফিসের? কী লিখেছে?'

—'পড়ে দ্যাখ না। অদিতিও পড়েছে।'

বকুলবালার গলায় হাল্কা আলো জ্বলে। মা আবার বললেন,—'দুপুরে এসেছে রেজিস্ট্রি ডাকে। কী সব কাগজপত্র নাকি পাঠাতে হবে তাড়াতাড়ি। তারপর ওরা চেক পাঠাবে। বেশ বড় অঙ্ক। কম্‌পেন্‌সেশন বোধ হয়, না রে?'

বকুলবালার হাল্কা আলো ক্রমাগত উজ্জ্বল। তাকাই। উনি স্বাভাবিক—অস্বাভাবিকতার সূক্ষ্ম অবস্থানে অস্থির। মনে মনে বলি, জানি না, সমাচারের ভাষায়—মনুহাফ্‌জা। বকুলবালার আলোকিত গলা বলে যায়, —'টাকাগুলো অদিতির কাজে লাগবে, না রে বিজু? শিলিগুড়ি থেকে তাগাদা এসেছে গত সপ্তায়। হাতছাড়া হলে মুস্কিল। আর কতদিন অপেক্ষা করবে? তুই আজই লিখে দে আমরা তৈরি। আমরা প্রায় তৈরি। রাতেই লিখে দে বিজু।'

মা চলে গেলেন একতলায়। একটা দীর্ঘস্থায়ী শোকেরও কী ভয়ঙ্কর মৃত্যু হয়ে গেল একটু আগে। এই নির্মমতার খবর কি কোনোদিন রেখেছে বারুদের গন্ধে ভরা পৃথিবী?

তুমি মঙ্গল করো, নির্মল করো—গান গাওয়া বকুলবালার কণ্ঠ একটু আগে যা বলে গেল—অদিতি, বাবা দাদার বিল্টু শুনতে পায়নি।

শুনলে কী বলত—কে জানে?